প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা : চার যোগের সমন্বয়ের রূপকার

প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা

এযুগের সৌভাগ্য, স্বয়ং সপ্তর্ষির ঋষি অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম নির্দেশ করে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই নতুন যুগের নতুন আচার্য। সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনকে আলোকস্তম্ভরূপে স্থাপন করা তাঁর অন্যতম অবদান। মানবসমাজের কল্যাণে স্বামীজীর বহু অভূতপূর্ব পরিকল্পনার মধ্যে একটি হল : প্রচলিত চারটি যোগের সমন্বয়ের ভাবনা। সকল যোগের সুষম সমন্বয়ে অন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের প্রেক্ষিতে তিনি এই ভাবনাটিকে উপস্থাপিত করেছেন এবং আশা করেছেন সকল মানুষের জীবনে—বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সদস্যদের জীবনে তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হবে।

স্বামীজী মহারাজের পরিকল্পনাটি কী? মনের প্রবণতা অনুসারে মানুষকে চারটি শ্রেণিতে ফেলা যায়—যুক্তিবাদী, ভাবপ্রবণ, কর্মপ্রবণ এবং রহস্যবাদী। এই চাররকম মানুষের জন্য শাস্ত্র চাররকম পথ বা যোগ নির্দিষ্ট করেছেন : জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও রাজযোগ। 'যোগ' তা-ই যা মানুষকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে। মানুষের—বিশেষত আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে উদ্যমী মানুষের—জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। অতএব যে-মানুষের চরিত্রে যে-প্রবণতা অধিক, সেই প্রবণতাকেই যোগ হিসেবে, বা বলা যায় সোপান হিসেবে ব্যবহার করে সে পরমপুরুষার্থ লাভের চেষ্টা করবে। একই মানুষের মধ্যে আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবণতার প্রাধান্য দেখা যায়। তাই একজন মানুষ তার সবগুলি প্রবণতাকেই যাতে সমভাবে ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে, আর তার সম্পূর্ণ সময় ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে পারে, সেজন্যই চারটি যোগের সুষম সমন্বয়ের ধারণাটি গড়ে উঠেছে।

স্বামীজী 'বেলুড় মঠের নিয়মাবলী'র প্রথমেই বলেছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনে নিজের মুক্তিসাধন ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে প্রদর্শিত প্রণালী বলতে তিনি যা যা বুঝিয়েছেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম এই চারটি যোগের সমন্বয়। তিনি বলেছেন, "Such a unique personality, such a synthesis of the utmost of Jnana,

Yoga, Bhakti and Karma, has never before appeared among mankind. The life of Sri Ramakrishna proves that the greatest breadth, the highest catholicity and the utmost intensity can exist side by side in the same individual, and that society also can be constructed like that, for society is nothing but an aggregate of individuals.

"He is the true disciple and follower of Sri Ramakrishna, whose character is perfect and all-sided like this. The formation of such a perfect character is the ideal of this age, and everyone should strive for that alone."

স্বামীজী মনে করেছেন, উক্ত চারটি যোগের সমন্বয় যার জীবনে হয়নি, বুঝতে হবে তার জীবন 'রামকৃষ্ণ-মুষায় দ্রুত' হয়নি। মুষা শব্দের অর্থ ছাঁচ। ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে কামারশালায় বিভিন্ন জিনিস প্রস্তুত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ছাঁচে ঢেলে যে-জীবন গড়ে উঠবে তাতে যোগচতুষ্টয়ের সুসমঞ্জস সমন্বয় দেখা যেতেই হবে।

এই যোগের সমন্বয় স্বামীজী পরিস্ফুট করেছেন সঙ্ঘের মনোগ্রাম বা প্রতীকটির মাধ্যমে। এটি তাঁরই আঁকা। প্রতীকের মাঝখানে রয়েছে হংস—পরমাত্মার প্রতীক, তরঙ্গায়িত জল কর্মের প্রতীক, জলে ফুটে থাকা পদ্ম ভক্তির ও সূর্য জ্ঞানের প্রতীক। আর এই সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে থাকা সর্পটি যোগের প্রতীক। অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগের সম্মিলনে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

স্বামীজীর আশা ও আশীর্বাদ সফল করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বেশ কয়েকজন মহামানবকে উপহার দিতে পেরেছে, যাঁদের জীবনে এই যোগচতুষ্টয়ের সুষম সমন্বয় ঘটেছে। স্বামীজী মঠের নিয়মাবলীর প্রথম নিয়মেই পুরুষমঠের অনুরূপ একটি স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্নসম্ভব সেই মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা-মাতাজীর জীবনেও চারযোগের সমন্বয় দেখে সমাজ ধন্য ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে আমরা দেখব জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ তাঁর জীবনকে কীভাবে আশ্রয় করেছিল।

একজন মানুষের জীবনে বিভিন্ন যোগ কীভাবে সমন্বিত হয়েছে দেখতে গেলে, এক-একটি যোগ ধরে আলাদা-আলাদাভাবে বিচার করা ছাড়া পথ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যোগগুলি পরস্পর 'অত্যন্তভিন্ন' নয়—একটির সঙ্গে অপরটি প্রায়শই মিশে যেতে থাকে। তলিয়ে দেখলে যেকোনও কাজের সঙ্গেই এই চারটি যোগ ওতপ্রোত থেকে যায়। খাদ্য তৈরি বা রান্না কর্মটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাবনা—কী করলে খেয়ে পুষ্টি-তুষ্টি হবে সে-সম্পর্কে সম্যক ধারণা; এটি জ্ঞান। জড়িয়ে আছে কল্যাণকামনা, ভালবাসা—যারা খাবে তাদের জন্য; এটি ভক্তি। কর্ম তো চলছেই—কুটনো কোটা, সেদ্ধ করা, ফোড়ন দেওয়া, মশলা বাটা ইত্যাদি। তারই মধ্যে রয়েছে অনবরত মনের যোগ—যা না থাকলে কাজগুলি প্রয়োজনমতো ক্রমানুসারে করা যেত না।

অতএব চারটি যোগই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সূক্ষ্ম বিচারে তাই চারটি যোগের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হয় না। 'রজস্তমশ্চাভিভূয়' ইত্যাদি গীতাশ্লোকে (১৪।১০) যেমন বলা হয়েছে, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনটির গুণের মধ্যে সর্বদা একটি গুণ অপর দুটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। মানুষের মধ্যে যে-গুণটির আধিপত্য দেখা যায় সেই গুণান্বিত বলে মানুষটি আখ্যাত হয়—তার অর্থ এই নয় যে বাকি দুটি গুণ তার মধ্যে একেবারেই নেই। অল্প পরিমাণে হলেও অবশিষ্ট গুণদুটি থাকেই। ঠিক সেইরকম, একটি যোগের অধিক প্রকাশ দেখেই সাধককে ওই যোগের নামে চিহ্নিত করা হয়।

অবশিষ্ট তিনটি যোগের উপাদানও একটি নির্দিষ্ট যোগ-অবলম্বনকারীর মধ্যে উপস্থিত থাকেই। চারটি যোগের সহাবস্থান সম্পর্কে পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলেছেন : ''সকলের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা থাকে সেটা ভক্তির element। সব কাজের মধ্যেই ঠিক-বেঠিক, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত বিচার থাকে যেটা জ্ঞানের element, আবার মনঃসংযোগ সব কাজেরই ভিত্তিভূমি যেটা রাজযোগ। আর কর্ম তো শুধু কর্মযোগীর ক্ষেত্রে নয়, সব পথেই কর্ম উপস্থিত ও অপরিহার্য।''

অর্থাৎ যেকোনও মানুষের পক্ষে, বাকি তিনটি যোগ-নিরপেক্ষ একটিমাত্র যোগের পথ অবলম্বন করা অসম্ভব। একটি পাত্রে চারটি আলাদা তরল ঢাললে তারা যেমন মিশে যাবেই, তেমনই সাধকের জীবনপাত্রে চারটি যোগেরই উপাদান মিলেমিশে যায়। ভারতীপ্রাণামাতাজীর কথা আলোচনা করতে গিয়েও দেখা যাবে যে তাঁর জীবনে মিলেমিশে গিয়েছে চারটি যোগ। তবু আলোচনার সুবিধার্থে বাহ্যত তাঁর জীবনে প্রকাশিত বিভিন্ন যোগ পৃথকভাবে উল্লিখিত হচ্ছে।

জ্ঞানী

আশৈশব পারুল ছিলেন অন্তর্মুখ এবং সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন। সামাজিক রীতি অনুসারে বাবা-মা তাঁর বিবাহ দিলেও সংসার তাঁকে টানতে পারেনি। কয়েক বছর পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় হলে তিনি সকলকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে গৃহত্যাগ করেন। সে ছিল একেবারেই অজানিতের, অনিশ্চয়তার পথে ঝাঁপিয়ে পড়া। তখনকার দিনে এ-আচরণ একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের পক্ষে এবং তাঁর নিজের পক্ষেও কতটা সম্মানহানিকর হতে পারে তা বোঝার জন্য সতেরো বছর বয়স যথেষ্ট, তবু অপরিসীম বৈরাগ্য এবং একটি ঈশ্বরময় জীবনের হাতছানি তাঁকে চালনা করেছিল। ঈশ্বরে অনুরাগ এবং সংসারে বিরাগই তো জ্ঞানের প্রথম সোপান!

জ্ঞানের সঙ্গে তপস্যার সম্পর্ক নিবিড়। 'জ্ঞানী' বলতেই সাধারণত কঠোর তপস্বী, বিচারনিষ্ঠ, বৈরাগ্যবান এক সাধকের ছবি মানসপটে ফুটে ওঠে। ভারতীপ্রাণামাতাজীকে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে ওইভাবেই দেখতে পাই। দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি 'বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ... বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ' (গীতা ১৮।৫২—নির্জনবাসী, মিতাহারী, কায়মনোবাক্যে সংযত, বৈরাগ্যবান) হয়ে কাশীধামে তপস্যা করেছেন। আত্মপ্রচারবিমুখ মাতাজী পরবর্তী কালে সন্ন্যাসিনী ও ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যেটুকু প্রকাশ করেছেন সেটুকুই আমাদের উপাদান : ''কাশীতে থাকতে [জপ করতে] বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, হরিশ্চন্দ্রঘাট—ওইসব জায়গায় যেতুম। যখন খুশি বাড়িতে আসতুম—ইচ্ছা হলে রান্না করতুম, না হলে করতুম না।... বৃন্দাবনে থাকতে রোজ লক্ষ জপ করতাম। রান্নাবান্নার কোনও হাঙ্গামা ছিল না। একবার যমুনাতে স্নান করতে যেতাম শুধু। তারপর সেই এগারোটার সময় 'পারস' আসত—মদনমোহনের ভোগ। স্নান-খাওয়া বাদে সারাদিন শুধু জপ করতাম।'' তাঁকে সেইসময় যাঁরা দেখেছেন তাঁদের স্মৃতি সাক্ষ্য দেয় যে তিনি কারও সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথা একেবারেই বলতেন না, তাঁর শান্ত সমাহিত তপস্বিনী মূর্তি সর্বদা সকলের দৃষ্টি এবং সম্মান আকর্ষণ করত।

এর বাইরেও মাতাজীর সমস্ত জীবনই কেটেছে তপস্যার ভাবে। যখন উদ্বোধনবাড়িতে শ্রীশ্রীমা-যোগীন মা-গোলাপ মা-শরৎ মহারাজের সেবা করেছেন তখনও নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে সেবারূপ তপস্যা করেছেন। পরে তাঁর মুখের কথায় স্বীকৃতি মেলে : ''তখন সেবাই সাধনা, সেবাই তপস্যা।''

জীবনসায়াহ্নে যখন তিনি সারদা মঠের অধ্যক্ষা তখনও তাঁর শান্ত অনাড়ম্বর ভাবময় জীবন দেখে মঠবাসিনীদের মনে হত তিনি যেন মূর্তিমতী তপস্যা। এক মঠবাসিনী স্মৃতিচারণ করেছেন : ''তপস্যা ও কৃচ্ছ্রতা মার সহজাত ছিল। তিনি অতি সহজেই দৈহিক কষ্ট থেকে মন তুলে নিতে পারতেন। ওই সময় প্রতি শনি মঙ্গলবার উনি কালীবাড়িতে পুজো দিতে যেতেন একজনকে সঙ্গে নিয়ে। ছাতা বা জুতো কোনওদিন ব্যবহার করতেন না। অনেকবার মার সঙ্গে [মঠবাসিনীরা মাতাজীকে 'মা' সম্বোধন করতেন] দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণীর মন্দিরে গেছি। গ্রীষ্মের সেই প্রখর দিনগুলির কথা আমি কখনও ভুলব না। অত্যন্ত গরম রাস্তা, খালি পায়ে মার পেছনে কোনওরকমে লাফিয়ে হাঁটছি—পুজোর ফুল ও নৈবেদ্য নিয়ে যাচ্ছি তাই খালি পা, জুতো নেই। মার কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ধীরে ধীরে পথ চলছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করতে করতে।''

জ্ঞানীর 'সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ' (গীতা ৪।১৯)—সমস্ত প্রচেষ্টা ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমানশূন্য—এই গীতাবাক্য মাতাজীর জীবনে মূর্ত হয়েছিল। বৃদ্ধবয়সেও বহুবছর মঠে ঠাকুরপূজার ফল কাটা ইত্যাদি করেছেন অতি নিষ্ঠা সহকারে—প্রভুকে ভালবেসে আপনার চেয়েও আপন জ্ঞান করে। ফলের কথা চিন্তার অবকাশ কোথায়? তখন তিনি গুরু—বহু মানুষের জীবনতরীর কাণ্ডারী। সঙ্ঘের এবং ভক্তদের কল্যাণের জন্যই তাঁর প্রতিটি যাপন। অথচ সেই আচরণের পিছনে নেই এতটুকু কর্তৃত্বের বোধ। মঠ জীবনের প্রথম দিকে একবার আশ্রমের সকলেই কোথাও যান—ছিলেন শুধু ভারতীপ্রাণামাতাজী এবং এক আশ্রমবাসিনী—যিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেদিন মাতাজী সমস্ত কাজই নিজে করে নেন, ঝাঁটা হাতে ঘর পরিষ্কার পর্যন্ত। অসুস্থ আশ্রমবাসিনী পরে লিখেছেন : ''অন্যেরা ফিরে এলে, মাকে একাই সব কাজ করতে হয়েছে জেনে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। মা কিন্তু কিছু মনে করেননি, বড় বলে তাঁর কোনও অভিমান ছিল না।''

আর একটি ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরে সারদা মঠে একসময় মা তাঁর ঘরে পূজারিণীকে রাত্রে শুতে বলতেন, সময়মতো ঘুম থেকে তুলে দেবেন বলে (কতখানি নিরভিমান হলে তা সম্ভব)! ছোট ঘরটির একপাশে মার খাট, আর ছাদের দিকের দরজার কাছে মেঝেতে পূজারিণীর শোয়ার ব্যবস্থা। অসুবিধে ছিল এই, প্রবল বৃষ্টি হলে ছাদের দিকের দরজার তলা দিয়ে ঘরে জল ঢুকত। একদিন শেষরাত্রে পূজারিণী উঠে দেখেন, দরজার কাছে একজোড়া ন্যাতা-বালতি তাঁকে যেন বিদ্রূপ করছে! রাত্রের ব্যাপারটি বুঝে নিতে তাঁর দেরি হল না। পরে তিনি লিখেছেন : ''রাত্রে আমি যখন আরামে অঘোরে ঘুমুচ্ছি, মা তখন বৃষ্টির জল মুছে নিতে ব্যস্ত, যাতে আমার ঘুম না ভেঙে যায়। অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে আমি তাঁকে বলি, 'মা আপনি এ কি করলেন! কেন আমাকে ডেকে দিলেন না?' করুণাময়ী মা যেন কিছুই হয়নি এইভাবে বললেন, 'তোমাকে তো তিনটের সময় ঠাকুর তুলতে উঠতে হবে, তাই জাগাইনি।' আমি স্তম্ভিত!''

স্তম্ভিত হয়েছেন আরও অনেকে। নিবেদিতা স্কুল থেকে এক ব্রহ্মচারিণী কোনও কাজে মঠে এসেছেন। মা গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন দেখে তিনি মার সঙ্গে ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মা বললেন, ''তুমি গঙ্গায় নাইবে না?'' স্নানের জন্য অতিরিক্ত একটি কাপড় লাগবে, ব্রহ্মচারিণী তা আনেননি শুনে মা বললেন, ''দাঁড়াও, আমি এখুনি উঠে কাপড় ছাড়ছি, তুমি এই কাপড় পরে স্নান করে নাও।'' একে গেরুয়া, তায় ওঁর—ব্রহ্মচারিণী বাক্যহারা!

মায়ের অভিমানশূন্যতার দৃষ্টান্ত অপর্যাপ্ত।

গরমকালে মা কোনও কোনওদিন পুরনো অফিসঘরের মেঝেতে শুতেন ঠান্ডা বলে। তিনি শোবেন বলে তিনি যাওয়ার ঠিক আগে মেঝে মুছে রাখা হত। মাঝে মাঝে মা দুষ্টুমি করে ঘর মোছার আগেই সবার পায়ের ধুলোর মধ্যে শুয়ে পড়তেন এবং ঘর মোছার কথা যার, তার অপ্রস্তুত ভাবটি খুব উপভোগ করতেন। তিনি যে সঙ্ঘের অধ্যক্ষা, সে-অভিমান তাঁর ছিল না।

নিরহংকার মানুষই হতে পারেন 'বীতরাগভয়ক্রোধঃ' (গীতা ২।৫৬)—আসক্তি, ভয়, ক্রোধ কিছুই থাকে না তাঁর, কারণ এই সবগুলির পিছনেই মূল কারণ 'অহংবোধ'। ভারতীপ্রাণামাতাজী শ্রীশ্রীমাকে দেখেছেন জহুরির চোখ নিয়ে : ''মাকে দেখে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে মায়াতে কী ভীষণ জড়িয়ে আছেন! আর মার সংসারও তো ওইরকম ছিল। মাও এই জাগতিক মানুষের মতো কাঁদছেন। কেউ মারা গেলেন তো ডাক ছেড়ে সে কী কান্না! ব্যস ওই পর্যন্ত। তারপর যেমন সারাদিন কাজকর্ম করতেন আবার তখনই সেইভাবে করতে লাগলেন। এতেই বোঝা যায় মা সত্যিই কীরকম অনাসক্তভাবে সংসারে ছিলেন।'' স্বয়ং এই ভাবের মানুষ ছিলেন বলেই সরলা শ্রীশ্রীমার মহিমা বুঝতে পেরেছিলেন। মায়ের দেহত্যাগের পর সকলকে সাধারণ সুতির কাপড় এবং তাঁকে সিল্কের কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, ''মা-ই চলে গেলেন, আমি আর কাপড় নিয়ে কী করব!'' আপাতদৃষ্টিতে গৃহহীন, পরিবারহীন, ভবিষ্যৎহীন, এমনকী আশ্রয়হীন এক তরুণীর মুখে একথা খুব সামান্য নয়! এই বৈরাগ্যমাখা উক্তিটির প্রেক্ষিতে মনে পড়ে যায় আর একটি কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপ্রকট হওয়ার পর তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ''এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন, দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে!'' অন্তরের প্রাপ্তি যেখানে অনন্ত, সেখানে স্থূল পার্থিব বস্তুতে জ্ঞানীর 'বীতরাগ' হওয়াই স্বাভাবিক।

মাতাজীর 'বীতভয়'ত্বের প্রমাণ মেলে তাঁর কাশী-বৃন্দাবনের জীবনে। রাজা মহারাজের কাছে শুনেছিলেন শ্মশানে জপ করলে শীঘ্র মন্ত্রচৈতন্য হয়। সঙ্গী না পেলে একাকীই চলে যেতেন সেসব স্থানে, যত রাতই হোক না কেন জপের সংকল্পিত সংখ্যা শেষ করে ফিরতেন। মন্দবুদ্ধি মানুষ ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ সাধিকার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

বাকি রইল 'বীতক্রোধ'ত্ব। মাতাজীর প্রথম এবং মধ্যজীবন মহতের আশ্রয়ে ও সান্নিধ্যে এত আনন্দে সেবামাধুর্যে নমনীয়ভাবে কেটেছে যে সেখানে ক্রোধপ্রকাশের ক্ষেত্র বা সুযোগ কোনওটিই থাকবার কথা নয়। সুযোগ হতে পারত শেষ জীবনে, যখন তিনি মঠাধ্যক্ষা। তিনি কাটিয়ে এসেছেন নিরবচ্ছিন্ন সেবাময় তপোময় সাধনজীবন; আর তাঁর নেতৃত্বে সমাগত আশ্রমবাসিনীরা—বিশেষত নবাগতারা বহুলাংশে গৃহকর্মে সেবাকর্মে অপটু, দেবসেবায় অনভিজ্ঞ; সর্বোপরি প্রজন্মগত ব্যবধানের ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারিণী। এত কিছু সত্ত্বেও মাকে কেউ কোনওদিন 'সুলভকোপ' বলে ভাবতে পারেননি। এক সন্ন্যাসিনী লিখেছেন : মাতাজীর ''রাগ অতি অল্প সময়েই মিলিয়ে যেত। একবার তাঁর সঙ্গে একমাস মাদ্রাজে থাকাকালীন কার্যগতিকে আমার মতো সেবার কাজে অপটু একজনের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত কাজের ভার পড়েছিল। মাদ্রাজ থেকে ত্রিচুর যাবার সময় আমি একটি বড় ভুল করি। ওষুধ ইত্যাদি অন্যান্য জিনিস গুছিয়ে নিই, কিন্তু তাঁর জপের আসনটি সঙ্গে নেবার কথা মনে হয়নি। ট্রেনেই খুব ভয় ও সঙ্কোচের সঙ্গে ব্যাপারটি ওঁকে জানাই। উনি খুব গম্ভীর হয়ে যান। ত্রিচুর সারদা মন্দিরে পৌঁছেই

ধীরাপ্রাণাজীকে বলে নতুন আসনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীপ্রাণামাতাজী আর একটুও রাগ করে থাকেননি।"

ক্রোধের জন্য মাঝে মাঝে কষ্ট পান এমন এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন, ''যখনই মনে রাগ আসবে উঁচুস্বরে ইষ্টনাম জপ করবে।"

কেউ অন্যায় করলে প্রথমেই মাতাজী তিরস্কার করতেন না, বরং গম্ভীর হয়ে যেতেন। সেটাই ছিল অপরাধীর চরম শাস্তি। কিছুক্ষণ পর ক্ষমা চাইলে তখনই আবার হেসে কথা বলতেন, ভুল সংশোধনের উপায়ও বলে দিতেন।

এই সংযমই জ্ঞানীর চরিত্রের ভূষণ। মাতাজী সম্পর্কে এক সন্ন্যাসিনীর স্মৃতি : ''তাঁর কোনও ব্যবহারে আমরা অকারণ উচ্ছ্বাস লক্ষ করিনি।... ত্যাগবৈরাগ্যদীপ্ত নিঃস্পৃহ ভাবটাই তাঁর মধ্যে প্রধান ছিল কিন্তু এরই মধ্যে আবার প্রয়োজনমতো স্নেহ-ভালবাসার সরল সুন্দর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে আমরা অভিভূত হতাম।"

মাতাজীর এ-সংযম ছিল আচরণে তো বটেই, আহার-পরিধান ইত্যাদি সব বিষয়েই। হবে নাই বা কেন—উদ্বোধনে থাকতে যে একটিমাত্র দাঁতভাঙা চিরুনিতে শ্রীশ্রীমা-রাধু-মাকু-গোলাপ মা-যোগীন মা-সরলা সব্বাই চুল আঁচড়াতেন! কেউ একটি নতুন চিরুনি আনবার কথা বললে শ্রীমা বলতেন, ''চলে তো যাচ্ছে!" জীবনের প্রভাতবেলাতেই যাঁর জীবনবীণার তার এই সুরে বাঁধা হয়ে গেছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনচর্যা যে সংযমে মণ্ডিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! যেটুকু না হলেই নয়, সেটুকুই ছিল তাঁর প্রয়োজন, আজীবন। মাতাজীর ঘরটি ছিল ছাদের উপর, তবু খুব গরমেও তাঁকে পাখা চালাতে সহজে রাজি করানো যেত না। কাশীর প্রচণ্ড ঠান্ডায় একটি মাত্র গরম চাদর থাকত তাঁর গায়ে।

জ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ সমদর্শিতা। ভারতীপ্রাণামাতাজীর মধ্যে এটি সুপরিস্ফুট ছিল। সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণী বা ভক্ত—কারও মধ্যেই তিনি ছোট-বড়, নতুন-পুরনো বা ধনী-দরিদ্র ভেদ দেখতেন না। জননীর কাছে যেমন ভাল-মন্দ সক্ষম-অক্ষম সকল সন্তানই সমান, মাতাজীর কাছেও তাই ছিল। এক ভক্ত লিখেছেন, ''মার শিষ্যশিষ্যারা সর্বস্তরের ছিলেন—অভিজাত, বিশিষ্ট ঘরের থেকে সাধারণ ও অতি-সাধারণ ঘরের মহিলা ও পুরুষ। কিন্তু তার জন্য মার কাছে কোনও ভিন্ন দৃষ্টি দেখিনি। সবাই সমানভাবে তাঁর করুণা ও স্নেহ পেয়েছে।"

জ্ঞানের চরমে সাধক নামরূপের সীমা অতিক্রম করে যান। দেহত্যাগের সময় ভারতীপ্রাণামাতাজীর অপূর্ব অনুভূতি—যা বহু মানুষ স্বকর্ণে শুনেছিলেন—তা যথার্থই অনুভববেদ্য। সমবেত সকলের 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' ধ্বনিকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল তাঁর উচ্চকিত কণ্ঠ : 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।' সারাজীবনের ধন যে-শ্রীরামকৃষ্ণনাম ও রূপ, তাকেও অতিক্রম করে তাঁর মন তখন অনন্তের অবগাহী। শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ব্রহ্মানুভূতিতে, আত্মস্বরূপে তিনি যে সুপ্রতিষ্ঠিত, এ তারই ইঙ্গিত। মনে রাখতে হবে, মানবের অন্তরের অনুভূতির—বিশেষত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির—খুব সামান্য অংশেরই বাহ্য প্রকাশ ঘটে।

বস্তুত মাতাজীর সমগ্র জীবন দেখলে গীতার একটি শ্লোকের (৫।৩) কথাই মনে হয় :

''জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"

—যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দ্বেষ করেন না, সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই 'নিত্যসন্ন্যাসী' [কর্মে নিরত থেকেও সদা নিষ্কাম ও অনাসক্ত]। এইরকম রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বহীন মানুষ অনায়াসে বন্ধনমুক্ত হন। এই শ্লোকের প্রতিটি লক্ষণই মাতাজীর চরিত্রে কীভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তা এ-যাবৎ আলোচনায় আমরা দেখেছি।

ভক্ত

অল্পবয়সে অনিশ্চিতের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মধ্যেই পারুলের অন্তরের মূল সুরটি ধরা পড়ে। তাঁর জীবনরাগিণীর বাদীস্বর যদি বৈরাগ্য, তবে সমবাদী শরণাগতি। বহুদিন তাঁর স্থায়ী আশ্রয় বলে কিছু ছিল না। সুধীরাদি যখন যেখানে সুবিধা পেতেন তাঁকে পরিচয় গোপন করে লুকিয়ে রাখতেন। এজন্য কত পরিবারে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও অসহায় পারুলের ভাগ্যে জুটেছে। সবকিছুই সহ্য করেছেন—ভুল, গ্রহণ করেছেন হাসিমুখে—ভগবানের ইচ্ছা বোধে। এতকিছুর পরও অশ্রুমুখী স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর কোলে, দিদি-অন্তপ্রাণ ভাইবোনেদের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেননি একটিবারও। দৃঢ় প্রত্যয় ছিল—একমাত্র ভগবানকে সম্বল করে তাঁরই মুখ চেয়ে পড়ে থাকবেন। 'অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ' (গীতা ১২।১৯) যদি এঁকে না বলা যায়, তবে আর কাকে বলা যাবে?

তাঁর এক বোনের স্মৃতিচারণ : ''দিদিকে দেখবার জন্য ছুটে ছুটে স্কুলবাড়িতে যেতাম। উনি নিজের ভাবে থাকতেন। আমাদের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা কইতেন না। একদিন বিকেলে গেছি, গেটে তালা পড়ে গেছে, দিদিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। সেই উপরের দিকে কোণের ঘরে ধ্যান করছেন। গুনগুন করে গান গাইছেন—

'রাজরাজেশ্বর দেখা দাও,
করুণাভিখারি আমি, করুণানয়নে চাও।' ''

কী পবিত্র একটি ছবি! নিভৃতে ভগবানের কাছে প্রাণের আকুতি নিবেদন করা, তাঁর চরণে হৃদয় খুলে দেওয়া—এই-ই সরলার জীবনের সার সত্য।

শ্রীশ্রীমা এবং তাঁর পরিকরবৃন্দের অনলস সেবার মাধ্যমেও তাঁর ওই ভক্তিভাবটিই সুপরিস্ফুট। এক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন : ''শ্রীমার কাছে কতজনকেই দেখলুম, কিন্তু ওইরকম কাউকে দেখিনি। কারও সঙ্গে একটা কথা নেই, একমনে একটা ভাবের সঙ্গে সব করে যেতেন।'' কাশীবাসকালীন মাতাজীর সুকঠোর সাধনজীবনও তাঁর অপূর্ব ভক্তিরই বাহ্যরূপ। কোনওরকমে শরীরধারণের ব্যবস্থাটুকু করে সারাদিন জপধ্যান। আহারাদির ব্যবস্থা অতি সামান্য—তবু ওরই মধ্যে কত পরিপাটি! কারণ নিজের নিত্যপূজিত ঠাকুর-মাকে চারবেলা ভোগ না দিয়ে আহার গ্রহণ করতেন না—সে যত সামান্যই হোক। ঠাকুর-মাকে কেন্দ্র করেই জীবন আবর্তিত হত। ছোট বাড়িখানি—কিন্তু ঝকঝক তকতক করছে—দুবেলাই পরিষ্কার করা চাই কারণ ঠাকুর আছেন। বিকেলে দুটি বাতাসা ছাড়া আর কিছু ভোগ দেওয়ার সংগতি নেই কিন্তু ছোট্ট থালা-গ্লাসদুটি এমনভাবে মাজা যে মুখ দেখা যায়!

সারদা মঠে থাকাকালীন তিনি যেভাবে ঠাকুরসেবার ধারাটিকে ঠিক করে গিয়েছেন, তাতেই তাঁর অন্তর্লীন ভক্তিভাবটিকে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর সাক্ষাৎ বসে আছেন এই বোধে প্রতিমুহূর্তে তাঁর সুখসুবিধার দিকে লক্ষ রেখে সেবা করতে শিখিয়েছেন মাতাজী। অপূর্ব নিয়মনিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভালবাসার সঙ্গে তিনি মন্দিরে ঠাকুরের সেবা করতেন এবং সকলের মধ্যেও সেই ভাব জাগিয়ে দিতেন। বলতেন, ''আপনার লোকের মতো শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করবে।'' ঠাকুরসেবা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তাঁর ছিল এই আপনবোধ এবং ভালবাসা—যেমন, ফল বেশি ডুমো-ডুমো করে কাটা চলবে না, পাছে ঠাকুরকে বড় হাঁ করতে হয়; নিজেদের অন্ধকারে জপ করতে সুবিধা বলে ঠাকুরের মুখের সামনে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে রাখা চলবে না, ঠাকুরঘরে একসঙ্গে চার-পাঁচটি ধূপ জ্বালানো চলবে না পাছে ঠাকুরের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় ইত্যাদি। আবার ঠাকুরঘরের বাইরেও সব কাজ ঠাকুরেব ভেবেই যাতে সম্পন্ন

হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতেন। যার চা করবার রুটিন তাকে বলতেন, ''ভাববে, ঠাকুর এসে তোমার চা খাবেন। ঠিক ঠাকুরঘরের মতো নিষ্ঠা করে চা করবে।''

বহু ব্যাপারে মাতাজীর ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ দেখা যেত। মঠে শ্রাবণ সংক্রান্তি থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত সকালে ঠাকুরের ফলভোগে আদাকুচি ও ভিজে ছোলা দেওয়া হয়। একবার ঠাকুরঘরের কারুরই একথা মনে ছিল না। মাতাজী জপের পর বললেন, ''কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না, জপে বসে মনের মধ্যে কেবল উঠছে—আদা-ছোলা, আদা-ছোলা।'' দেখা গেল সেদিন পয়লা ভাদ্র, অথচ ভোগে আদা-ছোলা নিবেদন করা হয়নি।

মাতাজী তাঁর নিজের অন্তরের ভক্তি ও ভগবদ্‌ব্যাকুলতা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইতেন। জপধ্যানের আনন্দ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় সেদিকে তাঁর সদা-সচেতন দৃষ্টি ছিল। বলতেন, ''অনুরাগ নিয়ে, ব্যাকুল হয়ে খুব করে তাঁর নাম জপ করতে হবে। নিষ্ঠাভরে নাম করতে করতে তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মাবেই। ঠাকুরের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করে বলতে হবে—সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে তোমার পাদপদ্মে ভক্তি-ভালবাসা দাও।... কেঁদে কেঁদে বলতে হবে—তুমি দেখা দিয়ে বুঝিয়ে দাও। আমি এ-সংসারের কিছুই বুঝি না—শুধু তোমাকে বুঝতে চাই। তুমি না বুঝিয়ে দিলে আমি কি করে বুঝব! তুমি কৃপাময় প্রভু—তুমি আমাকে কৃপা করো। একটি বার দেখা দাও। ঠাকুর কীভাবে নিজে মুখ ঘষে ঘষে কাঁদতেন আর বলতেন—মা, আর একটা দিন চলে গেল, এখনও দেখা দিলি না মা? সকলে ভাবত পাগল! এইভাবে কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।... ঠাকুর ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চান না...। তাঁকে ডাকতে ডাকতে তাঁর প্রতি ভালবাসা হলে তবেই শরণাগতের ভাব আসে। মনে যেসব অঙ্কট বঙ্কট ওঠে তাঁকে ডাকতে ডাকতে তা সব চলে যায়।''

মাতাজী নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা কখনও কাউকে বলেছেন বলে জানা যায় না। তবে তাঁকে লেখা শরৎ মহারাজের চিঠিগুলির মধ্যে একটিতে দেখা যায় : ''শ্রীশ্রীমার কৃপায় তুমি আনন্দে আছ এবং যাঁহাকে ধরিলেই কেবল শান্তি পাওয়া যায় তাঁহাকে ধরিতে পারিয়াছ, তোমার পত্রে ঐকথা জানিয়া যোগীন মার ও আমার প্রাণে যে কত আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। যোগীন মা বলিলেন—'আমার ইষ্টলাভ হইলেও এত আনন্দ হইত কি না জানি না। একমনে একপ্রাণে মার সেবা করিয়াছিল বলিয়াই মার কৃপায় সরলার এই অবস্থা হইয়াছে। আশীর্বাদ করি মার পাদপদ্মে তার মন দিন দিন ডুবে যাক।' আমিও যোগীন মার সহিত তোমাকে ঐ আশীর্বাদ করি।''

যিনি মণিগ্রথনকারী সূত্রের মতো সকল সৃষ্ট বস্তুতে আছেন, অখিল শান্তির নিলয় সেই তাঁকেই সকলের ভিতর উপলব্ধি করে সরলা হয়ে উঠেছিলেন 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' (গীতা ১২।১৩)। তত্ত্বত জানা যায় যে জ্ঞানী ও ভক্তের গন্তব্য এক, তবু গীতার ভক্তিযোগে শ্রীভগবান তাঁর প্রিয়ভক্তের যে-লক্ষণগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি দেখলে মনে হয় জ্ঞানীর চেয়ে 'ভক্ত' একটু বেশি কিছু। সাংখ্যযোগে উল্লিখিত স্থিতপ্রজ্ঞ যদি 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং' ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হন তাহলেই তাঁকে 'ভক্ততম' বলা যাবে। আচার্যবর মধুসূদন সরস্বতী পূর্বোক্ত 'মৈত্রঃ' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'মৈত্রী স্নিগ্ধতা তদ্‌বান্।' সমস্ত প্রাণীর প্রতি যিনি স্নিগ্ধ, তিনিই 'মৈত্রঃ'। আর 'করুণঃ' তিনিই, যিনি 'সর্বভূত-অভয়দাতা।' এই দুটি শব্দ ভারতীপ্রাণামাতাজীর বিশেষণ হিসেবে যে কতখানি সুপ্রযুক্ত হবে তার প্রমাণ মেলে তাঁর

জীবনীগ্রন্থখানির পাতায় পাতায়। ঠাকুরের ফলভোগের পর ফলের খোসাগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে গোশালায় গিয়ে গোমাতাদের স্বহস্তে খাইয়ে আসাও মাতাজীর নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ত। তাঁকে যে মঠবাসিনী ও ভক্তেরা সকলে 'মা' বলে ডাকতেন তা আদৌ কৃত্রিম ছিল না—তা ছিল তাঁর স্বতঃউৎসারিত আন্তর মাতৃত্বের সর্বজনীন স্বীকৃতি মাত্র। জননীর মতো 'মৈত্রঃ' আর 'করুণঃ' কে? সাধারণ মাতা শুধু আপন সন্তানের প্রতি এমন মনোভাব পোষণ করেন, আর মাতাজীর অন্তরের মৈত্রী ও করুণা প্রবাহিত ছিল সকল জীবের প্রতি। 'ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম' ইত্যাকার জ্ঞানবাক্য মৃত্যুশয্যায় উচ্চারণের পরও ওই অপূর্ব করুণাই তাঁকে প্রার্থনা করিয়ে নিয়েছিল : ''সকলের অবিদ্যা দূর হোক, সকলের কল্যাণ হোক।''

কর্মী

এই প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে, চারটি যোগ পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। এ-যাবৎ আলোচিত 'জ্ঞানী' ও 'ভক্ত' অংশে মাতাজীর 'কর্মী'রূপটি অপ্রকাশিত নেই। শরৎ মহারাজের পূর্বোক্ত পত্রাংশে যোগীন মার উক্তিটি আবার স্মরণ করি : ''একমনে একপ্রাণে মার সেবা করিয়াছিল বলিয়াই মার কৃপায় সরলার এই অবস্থা হইয়াছে।'' শুধু শ্রীশ্রীমা নন, গোলাপ মা-যোগীন মা, শরৎ মহারাজ—সকলের সেবাই সরলা করেছেন একই আন্তরিকতা নিয়ে। পূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দজী স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, ''[শরৎ মহারাজের স্ট্রোক হওয়ার পর থেকে] সরলাদি ঠায় মহারাজের কাছে ছিলেন, সেই কদিন তিনি কোথাও যাননি। সর্বদা মহারাজের কাছে থাকতেন।... তিনিই মুখ্য সেবিকা ছিলেন বলতে গেলে।'' মাতাজী পরে নিজেই সানন্দে বলতেন, শ্রীশ্রীমা থেকে শরৎ মহারাজের সময় পর্যন্ত উদ্বোধনে থাকার দিনগুলিতে সেবাই ছিল তাঁর একমাত্র তপস্যা, এমনকী একশো আট জপের সময়ও পাওয়া যেত কদাচিৎ—তবু ওই নিরবচ্ছিন্ন কর্মের মধ্যে তাঁর অন্তরে আনন্দের প্রস্রবণ বইত। আজীবন তিনি ওই দিনগুলিকে স্মরণ করেছেন। এছাড়া 'পাশ করা নার্স' বলে তাঁর সম্মানই ছিল আলাদা। শরৎ মহারাজ প্রমুখ নিজেরা যেমন প্রথমাবধি ভক্তবাড়ির প্রয়োজনে সেখানে গিয়ে, থেকে সেবা করেছেন, তেমনি সরলাকেও প্রয়োজনে সম্ভ্রান্ত ভক্তবাড়িতে সেবা করতে পাঠাতেন, বলে দিতেন, ''ওকে মঠের মেয়ের মতো দেখবে।'' নিঃস্বার্থ, অনলস, পরিশ্রমী, সেবামাধুর্যে ভরপুর সরলা যেখানেই যেতেন, সকলের মন জয় করে নিতেন।

কাজ আরও বাকি ছিল। শ্রীশ্রীমা সরলাকে বলেছিলেন, ''তোমাকে আমার কিছু কাজ করতে হবে।'' সেই কাজ করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল অভাবনীয় পথে। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ যখন শ্রীশ্রীমার জন্মশতবর্ষে শ্রীসারদা মঠ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন, তখনই এ-প্রশ্ন তাঁদের সামনে আসে যে, সে-মঠের দায়িত্ব নেবেন কে। শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবিকা সরলা—যিনি বহুপূর্বেই স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছে সন্ন্যাসপ্রাপ্ত—তাঁর নাম এই সময়েই বিবেচিত হয়। তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ প্রথম জীবনে উদ্বোধনবাড়িতে দেখেছিলেন অসুস্থ শরৎ মহারাজের মাথাটি কোলে নিয়ে সরলা পরম যত্নে শুশ্রূষা করছেন। সেই ছবি তাঁর মনে অঙ্কিত ছিল। বারবার একথাটি তিনি স্মরণ করতেন এবং সরলার সংবাদ সর্বদা রাখতেন। সংসারের কালিমাহীন তপস্যাময় কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন, শ্রীশ্রীমা ও তাঁর পার্ষদবর্গের একান্ত সেবা, তাঁদের গভীর স্নেহ ও আস্থা অর্জন—সরলার এই বৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁকে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের কাছে চিহ্নিত করে দেয়।

সঙ্ঘাধ্যক্ষারূপে ১৯৫৯ সাল থেকেই—অর্থাৎ

বেলুড় মঠ থেকে শ্রীসারদা মঠ স্বতন্ত্র হওয়ার বছর থেকেই সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যদান ও ভক্তদের মন্ত্রদীক্ষাদান শুরু করতে হয় ভারতীপ্রাণামাতাজীকে। ক্রমে তাঁর নেতৃত্বে শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের কার্যাবলি সম্প্রসারিত হতে থাকে। মঠ ও মিশনের নতুন নতুন কেন্দ্র খোলা হয়। মাতাজী দমদমে ডিগ্রি কলেজ (১৯৬১), বারুইপাড়ায় মাদার ট্রেনিং সেন্টার ও জুনিয়র বেসিক স্কুল (১৯৬২), মাদ্রাজে মঠকেন্দ্র (১৯৬৫), দিল্লিতে মিশনকেন্দ্র (১৯৭০) প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার শতবার্ষিকী উৎসব (যথাক্রমে ১৯৬৩ ও ১৯৬৭ সালে) প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় উদ্‌যাপিত হয়। উৎসব-অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে মাতাজীর সময়োচিত পরামর্শ, অনুষ্ঠানগুলিতে তাঁর প্রেরণাময় উপস্থিতি ও বক্তব্য উপস্থাপন যেন নবপ্রাণের সঞ্চার করত। আবার বাইরের কর্মপরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাতে অন্তরের ঐশ্বর্যে সঙ্ঘ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের অন্তর্জীবন যাতে সুগঠিত হয়, সেজন্য মাতাজী ছিলেন সদাসতর্ক ও যত্নশীল। ত্যাগব্রতীদের জীবনে যাতে ত্যাগ ও প্রেম—এই দুটি বিষয় কার্যকরী হতে পারে; একইসঙ্গে লোকব্যবহার, কর্মকুশলতা—সব বিষয়েই তাঁরা যেন যথাযথ হয়ে উঠতে পারেন, সেজন্য তাঁর সচেতন প্রয়াস ছিল। ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনেও তিনি ছিলেন সদা তৎপর। গুরুভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে মঠবাসিনী বা ভক্ত—সকলেরই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল সমস্যার সমাধান করতেন স্বচ্ছন্দে। এমনভাবে উপদেশ-নির্দেশ দিতেন, মঠ যাতে সংসারী ভক্তদের সামনে অধ্যাত্মপথের আলোকবর্তিকা হয়ে অবস্থান করে, এবং ভক্তরা যেন শুধু আধ্যাত্মিক নয়—জাগতিক ক্ষেত্রেও মঠ থেকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার রসদ পান।

শ্রীশ্রীমার কন্যা ঠিক শ্রীশ্রীমার মতোই একাধারে গুরু ও 'সত্য জননী' হয়ে ত্যাগী-গৃহী সকলের ভার গ্রহণ করেছিলেন। কোথায় একান্ত তপশ্চর্যার স্বাধীন একক জীবন, আর কোথায় সমস্ত সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মহাভার বহন! মাতাজীর জীবন পরিক্রমা করলে মনে হয় এই কর্মযোগী চিরকাল শুধু ঐশী ইচ্ছার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে, যখন যেমন পরিস্থিতি তেমন কর্ম করে গিয়েছেন—অগ্রপশ্চাৎ কোনও চিন্তা বা নিজের ভালমন্দের চিন্তা লেশমাত্র ছায়া ফেলেনি তাঁর মনে।

মাতাজীর চরিত্রে জ্ঞানীর লক্ষণগুলি যেভাবে সুপরিস্ফুট হয়েছিল, তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাঁর কোনও কর্তব্য ছিল না ('আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে', গীতা ৩।১৭), তবু সঙ্ঘের আদেশে লোককল্যাণের জন্যই তাঁর কর্ম। স্মরণ করা যায়, 'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে (গীতা ৩।২০) জ্ঞানীর এভাবে কর্ম করা সমর্থিত হয়েছে। 'সংসিদ্ধি' শব্দের অর্থ চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলাভ দুই-ই হতে পারে বলে আচার্য শংকর মনে করেছেন। জ্ঞানলাভ অর্থটি গৃহীত হলে বলা যাবে, জ্ঞানলাভের পরও প্রারব্ধ কর্মক্ষয় বা অন্য কোনও কারণে জনক প্রমুখ কর্ম সহই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জ্ঞানীর পক্ষেও কর্ম সম্ভব।

যোগী

স্বামীজী বলেছেন, যোগের সঙ্গে সম্মিলিত হলেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম ফলপ্রদ হয়। এ-যাবৎ মাতাজীর চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের যে-উপাদান দেখা গেল, ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এর কোনওটিই যোগ ছাড়া সম্ভব হত না। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের পূর্বোক্ত কথাটি আবার স্মরণ করা যায় : যেকোনও যোগ অবলম্বনকারী সাধকের প্রতিটি কাজের ভিত্তিভূমি মনঃসংযোগ—সেটিই রাজযোগ। মনঃসংযোগ চিরকালই মাতাজীর

চরিত্রের ভূষণ। প্রথাগত শিক্ষা বেশি না থাকলেও, এবং অব্যবহিত পূর্বে কয়েক বছর প্রায় ভবঘুরের জীবন অতিবাহিত করেও, নার্সিং পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এই মনঃসংযোগ তাঁর জীবনে সর্বদা দেখা গিয়েছে। কাশীতে সাধনকালীন অনাহত ধ্বনি শ্রবণ তারই ফল। ঘটনাটি তাঁর মুখের ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যাক :

''একদিন রাত্রে, তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে, আমি জপ করছিলাম। রাজা মহারাজ বলতেন কাশীতে ওই সময়টা ভাল, তাই ওটা অভ্যাস করেছিলাম। সেদিন ঘণ্টাখানেক জপের পর খুব একটা মিষ্টি ঘণ্টার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এই রাত্রে কে কোথায় পুজো করছে বুঝতে পারছিলাম না। জপ বন্ধ করে বারবার কান পেতে শব্দ কোথা থেকে আসছে বোঝবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম না। এদিকে জপ করতে খুব ভাল লাগছে, উঠে গিয়ে ওপাশের মন্দিরে আলো আছে কি না, পুজো হচ্ছে কি না দেখবার ইচ্ছা হলেও উঠতে মন সরল না। ওই মিষ্টি ধ্বনি কিন্তু সমানে শুনতে লাগলাম। তারপর নিত্যকার মতো জপ সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম কিন্তু ওই মিষ্টি ধ্বনির রেশ যেন সব সময় চলতে লাগল, ভোরবেলা পর্যন্ত ওই ভাব ছিল। সারাদিন সব কাজকর্ম সেরে বিকেলে সেবাশ্রমে গিয়ে কেদারবাবাকে [স্বামীজীর শিষ্য স্বামী অচলানন্দ] সব বললাম। উনি খুব খুশি হয়ে বললেন, 'ওটা অনাহত ধ্বনি।' ''

প্রসঙ্গত, সমাধি বিষয়ে মাতাজী একদা প্রকাশ করেছিলেন নিজের অভিজ্ঞতা : ''সমাধিতে দেখা যায় সচ্চিদানন্দ-সাগরের জল ধীরে ধীরে উঠছে। ক্রমশ সেই জলে সমস্ত ডুবে যায়—তাকে বলে প্রলয়। যখন চারদিকে শুধু জল, তার ভেতর থেকে মৃদু শব্দ শোনা যায়—ওঁ ওঁ। তারপর জলের ভেতর মৃদু কম্পন খেলে যায়—প্রথম দেখা যায় একটি বিন্দু, ওঁ-এর বিন্দু। তারপরে আসে আলো।''

লক্ষণীয়, সারাজীবন বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতার মধ্যেও মাতাজীর চিত্ত স্থিরবিম্ব জলের মতো নিশ্চল। তিনি যখন শ্রীশ্রীমার সেবিকা তখনও দর্শকের চোখে অতুলনীয়া—''কারও সঙ্গে একটা কথা নেই, একমনে একটা ভাবের সঙ্গে সব করে যেতেন।'' কতখানি মনঃসংযোগ ও প্রশান্তি থাকলে এটি সম্ভব! যখন তিনি তপস্বিনী তখনও তাঁর অতিশান্ত মূর্তি, মিত আহার-বিহার-আচরণ সকলের সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে। এমনকী একজন লিখেছেন, তাঁর 'শান্ত মাধুর্য' যেন 'সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।' আর শেষ জীবনে তো কথাই নেই! তাঁর সরলতা, পবিত্রতা ও শান্তভাব সকলকে মুগ্ধ করত—তাঁর জীবনীগ্রন্থের প্রতিটি স্মৃতিচারণকারী একথা বলেন। এখন বিবেচ্য, জীবনব্যাপী চিত্তের এই প্রশান্তি একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন মন কর্মশূন্য—বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁকে কর্মী বলে মনে হলেও। দেহগত কর্মের ছায়াপাত মনে ঘটে না বলেই চিত্তহ্রদ স্থির থাকে। এবং এই ছায়াপাত ঘটে না কেন? আচার্য শংকর মনের কর্মলিপ্ততা ও কর্মশূন্যতার মাপকাঠি হিসেবে নির্দেশ করেছেন ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান না থাকাকে। মাতাজীর চরিত্রের এই দিকটি স্বভাবতই 'জ্ঞানী' অংশে আলোচিত হয়েছে। বস্তুত চারটি যোগ পরস্পর ওতপ্রোত বলেই, একটি বিষয়ের কথা বলতে গেলে স্বতঃই অপর একটি এসে উপস্থিত হয়। যেমন আরও বলা যায়, স্বামীজীর পরিকল্পিত কর্মযোগের ক্ষেত্রে কিন্তু উক্ত বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। দেহ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে-কর্ম চলে তার সঙ্গে মনকে—অর্থাৎ মনের প্রীতিকে যুক্ত করতে হবে, নচেৎ কর্ম হয়ে যাবে যন্ত্রচালিতের মতো নিষ্প্রাণ, প্রেমহীন। এই প্রীতিই ভক্তির উপাদান। মাতাজীর ক্ষেত্রে এই প্রীতি যে প্রতি মুহূর্তে সম্পৃক্ত ছিল তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই বিপুল, বহুমুখী, বহুমাত্রিক বিষয়টিকে সবদিক থেকে যথাযথ প্রকাশ করবার জন্য যে-পাণ্ডিত্য, অধিকার ও পরিশ্রমের ক্ষমতা প্রয়োজন, লেখকের তা নেই। প্রত্যুত সবচেয়ে অভাব উপাদানের—যার হেতু মাতাজীর আত্মপ্রচারবিমুখতা। অতএব আপাতত সিদ্ধান্ত এই : মহাসাগরের বুক থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে যেমন বলা যায় না যে এ-জল গঙ্গার বা যমুনার বা গোদাবরীর, তেমনই চারটি যোগ-সমন্বিত একটি জীবনের বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধার করেও বলা যায় না যে এটি জ্ঞানের বা ভক্তির বা কর্মের বা যোগের দৃষ্টান্ত। স্বামীজীর পরিকল্পিত তেমন চরিত্রে—এক্ষেত্রে ভারতীপ্রাণামাতাজীর চরিত্রে—একাকার হয়ে যায় জ্ঞানীর বিদ্বেষহীন আকাঙ্ক্ষাহীন স্থিরপ্রজ্ঞা ও শান্ত সংযমের সঙ্গে ভক্তের কোমলতা, সর্বভূতের প্রতি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত-থাকা প্রীতি; মিশে যায় নবানুরাগী কর্মীর উদ্যমের সঙ্গে যোগযুক্তের মহাস্থৈর্য। বস্তুত এই মিশে যাওয়াই 'শ্রীরামকৃষ্ণমুষায় দ্রুত' হওয়া। এমন সুষম সমন্বিত জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত লোককল্যাণে নিবেদিত—এর আর অন্য পরিণাম নেই।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করার প্রলোভন সংবরণ করা যায় না যে, স্বামীজী যোগসমন্বয়ে অনধিকারীদের জন্যও উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং তাদের পন্থাও স্থির করেছেন। কিডিকে একটি চিঠিতে (৩ মার্চ ১৮৯৪) তিনি লিখেছেন, ''আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; তবু আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, ভাবসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান এবং পরস্পরের অভাব পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে ঐ পূর্ণতা পেতে পারি। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হল না বটে, কিন্তু কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হল, আর সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্মমত হতে সুনিশ্চিত অগ্রগতি, তাতে সন্দেহ নেই।" এভাবে ব্যষ্টির আচরণীয়কে অসম্ভবস্থলে সমষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কৌশল সত্যিই আশ্চর্য প্রতিভার পরিচায়ক।

অপর একটি চিঠিতে স্বামীজীর উদ্‌ঘোষণ : ''আমি শুষ্ক সুকঠিন যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে তীব্র কর্মের মশলাতে সুস্বাদু করে এবং যোগের পাকশালায় রান্না করে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে।" স্বামীজী মানবসভ্যতার মনের খাদ্য জোগানের জন্য নিজে সারাজীবন তা-ই করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর সংশয় ছিল যে, তাঁর প্রচারিত তত্ত্বগুলির প্রয়োগ বাস্তবে দেখতে না পেলে মানুষ তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে 'ইউটোপিয়ান' বা অবাস্তব কল্পনা বলে মনে করবে। স্বামী সারদানন্দই প্রথম এই যোগসমন্বয়ের তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করে স্বামীজীকে নিশ্চিন্ত করেন। যত দিন যাচ্ছে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু মহাপুরুষের জীবনেই এই যোগচতুষ্টয়ের সমন্বয় লক্ষ করে জগৎ কৃতার্থ ও অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

শ্রীসারদা মঠ। যুগাচার্যের আকাশহৃদয়ে সযত্নে লালিত একটি করুণাঘন স্বপ্ন। সে-স্বপ্ন ভূমিতে নেমে এসে ছুঁয়ে দিল জনমদুখিনী ভারতললনার ললাট। পৃথিবীতে সেই প্রথম স্বাধীন নারীমঠ। তার প্রথম অধ্যক্ষার জীবনে কীভাবে স্বামীজীর প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে তা আমরা দেখলাম। স্বামীজীর আরও আশা ছিল : ''মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ব্রহ্মজ্ঞা হন, তবে তাঁর প্রতিভাতে হাজারো মেয়ে জেগে উঠবে, এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ হবে।" ক্রান্তদর্শী ঋষির আকাঙ্ক্ষার অর্ধেক পূর্ণ হয়েছে, বাকিটুকু সময়ের অপেক্ষা। এ সাধারণ মানবমনের কল্পনা নয়, এ স্বামীজীর দর্শন।